মহাজীবনের কবি জীবনানন্দ দাশ

এক একজন কবিকে যদি আকাশের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে তুলনা করা হয় তবে আমি বলবো জীবনানন্দ দাশ ছিলেন সব ক'টি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমন্বয়। আধুনিক বাংলা কবিতায় এত দ্যুতি খুব কম কবিই ছড়িয়েছেন। তাঁর কবিতার বিচ্ছুরিত আলো এখনও পথ দেখিয়ে চলেছে বাঙালি কবিদের। জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লিখতে গেলেই যে পঙক্তিগুলি প্রথমেই চোখে ভেসে ওঠে তা হলো-

> 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
> যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা;
> যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই- প্রীতি নেই- করুণার আলোড়ন নেই
> পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।' (অদ্ভুত আঁধার এক)

কিংবা

> 'চোখে তার
> যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!
> স্তন তার
> করুণ শঙ্খের মতো- দুধে আর্দ্র- কবেকার শঙ্খিনীমালার!
> এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।' (শঙ্খমালা)

যে কয়জন বাঙালি আধুনিক কবির কবিতা মানুষের মুখে মুখে সবচেয়ে বেশি পঠিত হয়েছে তার মধ্যে কবি জীবনানন্দ দাশ অন্যতম। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দির অন্যতম আধুনিক বাঙালি কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর মা কুসুমকুমারী দাশও ছিলেন একজন কবি। জীবনানন্দ দাশের আদি নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরে গাঁওপাড়া গ্রামে।

বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশকে 'শুদ্ধতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতাবাদী পঞ্চপান্ডবের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ অন্যতম। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবি বা পাঠক মহলে তেমন সাড়া ফেলেনি। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রামাণিক-ইতিহাসের রচয়িতা সুকুমার সেন 'ঝরা পালক'-এ অন্তর্ভুক্ত 'পলাতক' কবিতার সমালোচনা করে বলেছিলেন-

> 'ঝরা পালকের একটি কবিতায় দ্বিতীয়-তৃতীয় দশাব্দসুলভ পল্লী রোমান্সের অর্থাৎ করুনানিধান-জ্যোতিন্দ্রমোহন-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস-শরৎচন্দ্র প্রমুখ কবি, গল্পকার ও লেখকদের অনুশীলিত ছবি পাই।'

-তিনি জীবনানন্দ সম্পর্কে আরও বলেছিলেন-

> 'ইংরেজি কবিতার অনুসরণে যাহারা বাংলায় কবিতাকে অবলম্বন করিলেন তাহাদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ প্রধান।'

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় আধুনিক কবিতার কারিগর যে পাঁচজন কবি- জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তী- তাঁরা সবাই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। সেই সাথে বলা যায় বাংলা কবিতায় আধুনিকতার যে বাঁক সৃষ্টি হয়েছিল তা মূলত ইংরেজি আর ইউরোপিয়ান সাহিত্যের উৎসধারা থেকেই। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যে কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পান্ডুলিপি' থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দির শেষভাগে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় ততদিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবিতে

পরিণত হয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশের মতো বাংলা সাহিত্যে কিংবা কবিতায় আর কোনো কবিকে এত বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে কিনা জানা নাই। তাঁকে বলা হয় ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি এবং রূপসী বাংলার কবি। এছাড়াও বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবিও বলা হয় তাঁকে। জীবদ্দশায় অসাধারণ কবি হিসেবে পরিচিতি থাকলেও তিনি খ্যাতি অর্জন করে উঠতে পারেননি। এর জন্য তার প্রচারবিমুখতাও দায়ী; তিনি ছিলেন বিবরবাসী মানুষ। তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার পথিকৃতদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের জীবন এবং কবিতার উপর প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, বাংলা ভাষায়।

এর বাইরে ইংরেজিতে তার ওপর লিখেছেন ক্লিনটন বি সিলি, আ পোয়েট আপার্ট নামের একটি গ্রন্থে। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসিসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তার কবিতা অনূদিত হয়েছে। তিনি যদিও কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত কিন্তু মৃত্যুর পর থেকে ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ অবধি তার যে বিপুল পাণ্ডুলিপিরাশি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা ১৪ এবং গল্পের সংখ্যা শতাধিক।

জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রকাশকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে কেবল প্রথম প্রকাশনার বৎসর উল্লিখিত। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর দীর্ঘ কাল পর ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি। ইত্যবসরে কবির মনোজগতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি রচনাকৌশলও অর্জন করেছে সংহতি এবং পরিপক্কতা। তার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ বনলতা সেন প্রকাশিত হয় ১৯৪২-এ। এটি "কবিতাভবন সংস্করণ" নামে অভিহিত। সিগনেট প্রেস বনলতা সেন প্রকাশ করে ১৯৫২-তে। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ সহ পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ মহাপৃথিবী ১৯৪৪-এ প্রকাশিত। জীবনানন্দর জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছু আগে প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কবির মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো ১৯৫৭-তে প্রকাশিত রূপসী বাংলা এবং ১৯৬১-তে প্রকাশিত বেলা অবেলা কালবেলা।() জীবনানন্দ দাশ রূপসী বাংলা'র পাণ্ডুলিপি তৈরি করে থাকলেও জীবদ্দশায় এর প্রকাশের উদ্যোগ নেন নি। তিনি গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নাম নির্ধারণ করেছিলেন বাংলার ত্রস্ত নীলিমা। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশকালে এর নামকরণ করা হয় "রূপসী বাংলা।" তার অগ্রন্থিত কবিতাবলি নিয়ে প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলো হলো: সুদর্শনা (১৯৭৩), আলো পৃথিবী (১৯৮১), মনোবিহঙ্গম, হে প্রেম, তোমারে ভেবে ভেবে (১৯৯৮), অপ্রকাশিত একান্ন (১৯৯৯) এবং আবছায়া (২০০৪)।

কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার আঁকড় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। অব্যবহিত পরে গ্রন্থিত -অগ্রন্থিত সকল কবিতার পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল মান্নান সৈয়দের উদ্যোগে। পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত আরো কবিতা অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষেত্র গুপ্ত ২০০১-এ প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে ভূমেন্দ্র গুহ প্রতিক্ষণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত-গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার আঁকড় গ্রন্থ পাণ্ডুলিপির কবিতা (১৪ খন্ড)।

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচনায় পুরস্কৃত করা হয়। কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪) সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে ১৯৫২ সালে পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ “বনলতা সেন” কাব্যগ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচনায় পুরস্কৃত হয় এবং তার মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে “জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা” (১৯৫৪) সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করে।

বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক, কবি বুদ্ধদেব বসু কবি জীবনানন্দকে নির্জনতার কবি হিসেবে আখ্যা দেন। কারণ হতে পারে কবির প্রচারবিমুখতা। তিনি ছিলেন বিরসবাসী মানুষ। জীবদ্দশায় তার এই প্রচারবিমুখতার জন্য খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। তাই হয়তো কবি বুদ্ধদেব বসু তাকে নির্জনতম কবি হিসাবেই আখ্যা দিয়েছিলেন। কবি জীবনানন্দ দাশ প্রথমদিকে জনপ্রিয়তা পাননি কারণ তার রচনার প্রতি অনেকেই বিমুখ ছিলেন। একজন প্রকৃত কবির কবিতা সাধারণের বোঝা সহজ নয়, এ-কারণেই হয়তো অনেকেই তাঁর কবিতার প্রতি বিমুখ ছিলেন। জীবনানন্দের কবিতা পড়তে হয় ধীরে-সুস্থে, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়। জীবনানন্দ একজন খাঁটি কবি ছিলেন। তার প্রমাণস্বরূপ একটি লাইন উল্লেখ করি-

'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে'।

-আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে কবি জীবনানন্দ একটি লাইনে এঁকেছেন। একেই বলে magic line. আকাশ শব্দটির পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই আকাশের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে কবিতার শব্দের এমন মূল্যবোধ খুব কম কবিই দিতে পেরেছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা আর সবার মতো আমাকেও মুগ্ধ করে। তাঁর কবিতা আমাকে আলোকিত আর শিহরিত করে রেখেছে জীবনের প্রতিটি বাঁকে। কী কারণে জীবনানন্দের কবিতায় এত মুগ্ধ হই তা বলতে গেলে কমই বলা হয়। জীবনানন্দের কবিতায় মিল-অন্ত্যমিলের ব্যবহার অতুলনীয়। তাঁর কবিতার বিষয়, উপমা, অনুপ্রাস তার নিজস্ব এবং সতন্ত্র। জীবনানন্দের কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য শব্দ, স্পর্শ, রং, রূপ, গন্ধ এবং অনুভূতিমুখর বাণী। যেমন-

'কাল রাতে- ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ।'

-তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার পথিকৃতদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের জীবন এবং কবিতার উপর প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং এখনো রয়েছে বাংলা ভাষায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম এ (১৯২১) পাস করেন। তিনি 'দৈনিক স্বরাজ' নামে একটি পত্রিকার সাহিত্যপাতা সম্পাদনা করতেন। আধুনিক নাগরিক জীবনের হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও সংশয়ের চিত্র তার কবিতার মূল উপজীব্য। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশের নিসর্গ বিষয়ক কবিতা বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তীব্রভাবে এদেশের সংগ্রামী জনতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন-

"তোমার কবিতা চিত্ররূপময়; তাতে তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।"

-রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণ ভুল নয়। সত্যিই তো, জীবনানন্দের কবিতায় ছবির পর ছবি দেখা যায়। এই ছবি যেমনতেমন সাদাকালো ছবি নয়, যেন রঙিন চলচ্চিত্র। তিরিশের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দই এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন-

'চারিপাশে বনের বিস্ময়
চৈত্রের বাতাস,
জোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন;
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে- যেইখানে জোৎস্না আর নাই
পুরুষহরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;' (ক্যাম্পে)

অথবা অন্য একটি একটি কবিতায় :

'হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?

বালতিতে টানিনি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাই নি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;' (বোধ)।

এই দুটি উদ্ধৃতিতেই কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চোখে একটি করে রঙিন ছবি ভেসে উঠবে। জীবনানন্দের কবিতাকে তাই চিত্ররূপময় কবিতা বলা হয়।

ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থের জন্যই যে কবি জীবনানন্দ দাশকে ধূসরতার কবি বলা হয় তা নয়; ঝরাপাতা, শিরশিরে হাওয়া, উর ব্যাবিলন মিশরীয় সভ্যতা- এসবই জীবনানন্দের কাব্য-বৈশিষ্ট্য। জীবনানন্দের কবিতা মানেই এক অমৃত শব্দপাঠ; এক আত্মতৃপ্তির ¯স্রোতে বয়ে চলে পাঠকের হৃদয়ে। বন্ধ্যাযুগের যথাযথ চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দের তুলনা নেই। মৃত্যুচেতনাও তার কবিতায় প্রায় প্রথম থেকেই দেখা যায়। শ্মশান, মরুবালু, আলেয়া ইত্যাদি কবিতার পটভূমি মৃত্যু। এই মৃত্যুচেতনা যুগযন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত। জীবনানন্দ একে জীবনে ধারণ করেছিলেন। যেমন একটি কবিতায় তিনি হতাশাভরে লিখেছেন-

'বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাঁইয়ে পড়ে আছে,
আমাদের সন্ততিও আমাদের নয়।'

-এরকম হতাশা আর বিবর্ণের কথা আছে তাঁর বহু কবিতায়। তার কবিতার চালচিত্রে আছে ধূসর বর্ণ। তাই জীবনানন্দ দাশকে ধূসরতার কবি বলা যুক্তিযুক্ত। জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে নিজস্ব বিষয়, ছন্দভঙ্গি, ভাষা, প্রতিভা নানা বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই ধূসর পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের মাধ্যমেই বাংলা কাব্যাঙ্গনে জীবনানন্দ দাশের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হতে শুরু করে।

তাছাড়াও 'বনলতা সেন' (১৯৪২) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। এ কাব্যের 'বনলতা সেন' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে খ্যাত। এবং জীবনানন্দের কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। ভারতীয় পুরাণের অন্তর্বয়ান যেমন-

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।'

এখানে বিদিশা, শ্রাবস্তী আর সিংহল সমুদ্রতীর, ছেড়ে এসে দেখি নাটোরের বনলতা সেন, পাখির নীড়ের মতো চোখ মেলে বলে 'এতোদিন কোথায় ছিলেন' আকস্মিক এ প্রশ্নের বিস্ময়ে শিহরিত হই। কবি শ্রীলংকা থেকে নাটোরে চলে এসেছেন এক পলকে। এতো দূরকে এতো কাছে এতো অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং সেখানে পাখি আর মানবের বন্ধন সেঁতু এঁকে দিয়েছেন সুচারুভাবে। একটু গভীরভাবে দেখলে দেখা যায়- জীবনানন্দ মূলত পঙ্ক্তিপ্রধান কবি। তার একেকটি উপমা একটি কবিতার স্বাদ আনে এবং সে উপমা বেশিরভাগ সময়েই বক্তব্য স্বচ্ছ ও অর্থকরী করার জন্য ব্যবহৃত হয় না, কেবলমাত্র একটি আবহ সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য। ফলে স্বভাবতই জীবনানন্দের কবিতা পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। কারণ জীবনানন্দের কবিতায় একটি ভাবের সাথে আর একটি ভাবের যোগসূত্র আবিষ্কার সাধারণ পাঠকের কাছে বেশ দুরূহ ব্যাপার। যেমন-

'রাতের বাতাস আসে
আকাশের নক্ষত্রগুলো জলন্ত হয়ে ওঠে
যেন কাকে ভালোবেসেছিলাম
তখন মানবসমাজের দিনগুলো ছিলো মিশরনীলিমার মতো।'

-এখানে ভালোবাসার গভীরতা বোঝাতে মিশরনীলিমার উপমা দেওয়া হয়েছে। পাঠককে এই মিশরনীলিমার উপমা বুঝে উঠতে হিমশিম খেতে হয়। জীবনানন্দ তাঁর নিছক প্রেমের কবিতার মধ্যেও প্রকৃতির প্রলেপ দেন। কখনো বিস্মিত শিশুর দৃষ্টি দিয়ে, কখনো ক্লান্ত পথিকের নিষ্পাপ স্পষ্টতায় এক

সরল ভঙ্গিমায় কোনো নবতর আত্মাকে আহ্বান করেন। প্রেম ও প্রকৃতি, খন্ডজীবন, হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ, ইতিহাসের বিশাল অনুভূতি এবং বর্তমানের ছিন্নভিন্ন অস্তিত্ব, এককথায় সমস্ত কিছুর সমাহার এই অপরূপ কাব্যে আলো-ছায়ার জাল রচনা করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'উপমা কালিদাসস্য' বলে একটি কথা আছে। সত্যিকার অর্থেই জীবনানন্দ দাশের কবিতা যেন উপমার যাদুঘর। যেমন-

* আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে।

* তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।

* নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা।

* পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

* উটের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা এসে।

* শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা

* অন্ধকারের মতো কালো চুল, ইত্যাদি

অশ্রুতপূর্ব উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ ভূমিকা রেখে গেছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতার শ্লথগতি, ছন্দস্পন্দ, অভিনব শব্দপ্রয়োগ ও অন্বয়, রূপময় ইন্দ্রিয়ালু বাক্যপ্রতিমাগুলি কাব্যকে অসামান্য মহিমা দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপমা প্রয়োগ নিয়ে মন্তব্য করেছেন- 'তার উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দূরগন্ধবহ'। তিনি কল্পনার সঞ্জীবনী মন্ত্রে অনুভূতি মুখর। এমন ধারা বাংলা কবিতায় সত্যিই অভিনব। তার কবিতায় এমন অনুভূতি জীবন লাভ করে, বিশ্বময়ী প্রকৃতি, জীবন, মৃত্যু, কাল সমস্ত কিছুই তার কাছে রক্ত-মাংসের মতো জীবন্ত। যেমন-

'আহলাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া-রোদ ক্ষুদ-কুঁড়া- কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে,
এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।'

-এখানে কবি জীবনানন্দ দাশ উপমা দিয়ে হেঁটেছেন পরাবাস্তববতার পথ ধরে, কখনো ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া জনপদে, আবার কখনো ব্যক্তিবোধের গভীর অতলে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, পুরনোর সঙ্গে নতুনের, অসম্ভবে-সম্ভবে, অবিশ্বাস্য-বিশ্বাসে, গ্রামের-নগরের, সমকালের-হাজার বছরের অদ্ভুত সংমিশ্রণ এঁকে দিয়েছেন কবিতায়।

রবীন্দ্রবলয় ছিন্নকারী ও উত্তরকালের কবিদের উপর সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী কবি হিসেবে বিবেচিত হন কবি জীবনানন্দ দাশ।

কবি জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলির গঠন সনেটে। কবি জীবনানন্দ দাশ এ কবিতায় তুলে এনেছেন বাংলার রূপকে। তিনি বিশ্বাস করতেন উপমাই কবিত্ব। বহুমুখী উপমায় বাংলার চিরায়ত রূপকে আঁকতে পেরেছেন একমাত্র তিনিই। তার কবিতার বিষয়বস্তু আবহমান গ্রাম বাংলার প্রকৃতি, নদীনালা, পশুপাখি, উৎসব, অনুষ্ঠান। জনপ্রিয়তার দিক থেকে আধুনিক বাংলা কবিতায় বনলতা সেন-এর পরেই রূপসী বাংলার স্থান। যেমন-

'আবার আসিব ফিরে, ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়,- শঙ্খচিল শালিখের বেশে,'

-কবিতাটি এ এন্থের বিখ্যাত উক্তি। অথবা

‘তোমরা যেখানে সাধ চ’লে যাও-,
আমি এই বাংলার পারে র’য়ে যাব;
দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;’

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় বারবার বাংলাদেশে ফিরেছেন, ফিরেছেন বাংলার প্রকৃতির কাছে। আর কোনো কবির কবিতায় এমন করে বাংলাদেশ কিংবা ফুল, পাখি, জীবজন্তু আসেনি। কার্তিকের ছায়া, হেমন্তের মিষ্টিরোদ, হিজলের জানলায় আলো আর বুলবুলি, হলুদ পাতায় শিশিরের শব্দ, বুনোহাঁস, শঙ্খচিল, পেঁচা, লাশকাটা ঘর, সোনালি ডানার চিল, নক্ষত্রের তারা জ্বলা রাত, সবকিছুই জীবনানন্দের কবিতায় স্পন্দন হয়ে এসেছে। এসেছে ভালোবাসার গভীর আবেশ হয়ে। শিরীষের ডাল, অশ্বথের চূড়া, কলমির ঘ্রাণ, হাঁসের পালক, শাদাবক এসেছে অলংকার হিসেবে নয়, এসেছে অবয়ব হয়ে কবিতার পরতে পরতে। যেমন-

‘বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে;
ছড়ায় রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন অঘ্রানে;’

এছাড়াও তাঁর ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা ‘হায় চিল’। তার বিখ্যাত কবিতা বনলতা সেন কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে পাশ্চাত্যের কবি অ্যাডগার এলেন পো’র ‘টু হেলেন’ কবিতাটির প্রভাব মেলে।

‘সব পাখি ঘরে আসে- সব নদী- ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।’

এখানে বনলতা সেনের সাথে কবির জীবদ্দশায় মিলনের ইঙ্গিত বোঝায় না, বরং জীবনাতীতে মিলনের ইঙ্গিত বোঝা যায়, স্বপ্নে কিংবা কল্পনায়। তার কবিতার একটি লাইন- ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে’ এই পঙক্তিতে কেবল ক্লান্তির কথা নয়, এর মধ্যে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতব্যাপী পরিভ্রমণের কথা ব্যাপ্ত আছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় স্থির থাকেননি এক স্থানে, সতত চলিষ্ণু তার কবিতা। তার কবিতা সন্ধানী। ক্রমপরিবর্তমান। ক্রমঅগ্রসরমান। প্রেম ও মৃত্যুর মতো দুই বিপরীতকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন অনন্য সুন্দরময়তায়। হৃদয় ও স্বপ্নকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া তার কবিতায় ইয়েটস, বোদলেয়ারেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু কবিতা নয়, তিনি মর্মগত, সুমিত, নিরাবেগ ও সুস্থির গদ্যলেখকও ছিলেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত “মাল্যবান’ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের মূল কাহিনি বর্ণনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আঙ্গিকে রচিত। দাম্পত্য জীবনের নিষ্ঠুর কাহিনি, জটিলতা ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার বোধ এক অসামান্য কুশলতার সাথে ইঙ্গিতময় ভাষায় রচনা করেছেন। ১৯৯৯ সালে খুঁজে পাওয়া তাঁর নতুন আর একটি উপন্যাসের নাম “কল্যাণী”। কবি জীবনানন্দ দাশ স্বপ্নের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলেও সবকিছুর উপরে তিনি তাঁর হৃদয়কে স্থান দিয়েছেন। আর তাই হৃদয়ের গভীর অন্ধকারেই রচিত হয় এমন কবিতা,

‘তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহবরে!
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।’ (নির্জন স্বাক্ষর)

জীবনানন্দ তাঁর নিছক প্রেমের কবিতার মধ্যেও প্রকৃতির প্রলেপ দেন। কখনো বিস্মিত শিশুর দৃষ্টি দিয়ে, কখনো ক্লান্ত পথিকের নিষ্পাপ স্পষ্টতায় এক সরল ভঙ্গিমায় কোনো নবতর আত্মাকে আহ্বান করেন

জীবনানন্দের কবিতা বহুমাত্রিক। কোনো নির্দিষ্ট কয়েকটি উপমা দিয়ে তার সমগ্র রচনাকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। জীবনানন্দীয় কবিতার জন্যই তিনি বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়ের গভীর গহবরে। নক্ষত্রের চেয়েও নিঃশব্দ আসনে, প্রতিটি কাব্যপ্রেমী মানুষের মনে। কী স্বল্প জীবন ছিল তাঁর! কিন্তু তার কবিতায়

সেই স্বল্পায়ু জীবনের ব্যাপ্তি এক মহাজীবনের সমান। তাঁর রেখে যাওয়া বহুমাত্রিক কবিতা পড়লেই বোঝা যায় “সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি”... এই কেউ কেউ কবির মধ্যে তিনিই অন্যতম, জীবনানন্দ দাশ। যার কবিতার মর্মকথা লিখে শেষ করা অসম্ভব।

তথ্যসূত্র :

1. http://mini.thesangbad.net/literature/sangbadliterature
2. উইকিপিডিয়া